দ্রোণাচার্য্য

সুব্রত রায়

লালুদা বাঁ-হাতে দেশলাই বাক্সটা ধরে ডান হাতে দেশলাই কাঠিটা দুবার বাক্সের গায়ে ঘষলেন। আগুন জ্বললো না। তারপর মুখের কাছে বাক্সটা এনে কয়েক সেকেন্ড মুখের গরম হাওয়া দিয়ে বাক্সটা গরম করলেন। এবার দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠলো। মুখের সিগারেটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিলেন। তারপর জানালা দিয়ে রাস্তার ওপারের নিম গাছটার দিকে উদাস ভাবে তাকিয়ে আস্তে আস্তে একটার পর একটা রিং ছাড়তে লাগলেন। লালুদা এমনিতে দিনে চার প্যাকেট সিগারেট খেতেন। গতবছর হাসপাতাল থেকে ফেরার পর কেয়া বৌদি পাড়ার ডাক্তার বরাটকে ডেকে আনেন। বরাট সব কাগজপত্র দেখে বললে - লালুদা সিগারেট খাওয়া একদম বন্ধ। লালুদা বলতে লাগলেন - না না তা কেমন করে হয়? এত দিনের অভ্যাস। বরাট বৌদির দিকে তাকিয়ে বললো - বৌদি, লালুদা কথা না শুনলে দুটো উপায় আছে। আমার বন্ধু মেজর প্রামানিকের সোনারপুরে একটা হোম আছে। প্রামানিক যে কোন নেশা ছাড়াবার পদ্ধতি জানে। ওখানে মাস দুই রেখে দিলে লালুদার সিগারেটের নেশা ছেড়ে যাবে। আর একটা কাজ করা যেতে পারে। আমি তারিখ না দিয়ে একটা death certificate লিখে যাচ্ছি। cause of death আমি heart failure লিখে দিচ্ছি। আরে heart বন্ধ না হলে death হবে কি করে? ও হ্যাঁ, আমার ball point pen টা রেখে যাচ্ছি। ঐ কলমটা দিয়ে সময়মত তারিখটা বসিয়ে নেবেন।

কেয়া বৌদি বড় বড় চোখ করে লালুদার দিকে তাকালেন। লালুদা বৌদিকে বেজায় ভয় করেন। লালুদা মিন মিন করে বলতে সুরু করলেন - আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা সকলে যখন বলছো তখন আর কি করা যাবে? বরাট এতক্ষণ মজা দেখছিল। এবার সে মুখ খুললো - বেশ, একদম সিগারেট বন্ধ করছি না। সপ্তাহে দুটো সিগারেট খেতে পারেন। রবিবার সকাল সাড়ে নটা আর বুধবার বিকেল সাড়ে চারটে। এই ঘরে বসে। বৌদি আপনি মাসে এক প্যাকেট সিগারেট কিনবেন। চার সপ্তাহে আটটা। আর যদি লালুদা সব নিয়ম কানুন মেনে চলেন তাহলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে অতিরিক্ত একটা। সেটা লালুদা যখন খুশি খেতে পারবেন। মনে রাখবেন এটা শুধু গুড কন্ডাক্টের প্রাইজ। আমি পাড়ার দোকানগুলিতে বলে যাচ্ছি কেউ যেন লালুদাকে সিগারেট বিক্রি না করে। যেখানে লালুদা আড্ডা দিতে যান সেখানেও বলে যাব লালুদাকে কেউ সিগারেট খেতে দেখলে আমাকে খবর দেয়। দরজা দিয়ে বেরোবার সময় মুখ ফিরিয়ে বরাট বললো - বৌদি, সিগারেটের প্যাকেটটা

কিন্তু আপনার কাছে থাকবে। দেখবেন আপনি যেন দুটান দিতে শুরু না করেন। আজকাল যাদবপুর দিয়ে যাওযার সময় প্রায়ই দেখি মেয়েগুলো কলেজের গেটের সামনে দাড়িয়ে এঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়ছে।

বরাট শুধু ডাক্তার নয়। পাড়ার অভিভাবকও বটে। লম্বায় ছফুট দুই ইঞ্চি, গায়ের রঙ আলকাতরার চেয়ে একটু পরিষ্কার, জেনারেল রায় চৌধুরীর মতো গোঁফ, চওড়া কাঁধ, বাজখাঁই গলার আওয়াজ - উত্তেজিত হলে তা আবার সরু হয়ে যায়। পাড়ার লোকেরা আড়ালে বরাটকে রাক্ষস বলে ডাকে। বরাট খুব অল্প ওষুধে চিকিৎসা করে। অন্য ডাক্তাররা বলে - বরাটের হাঁকডাকে রোগ জীবাণু পালিয়ে যায় তাই আর ওষুধ লাগে না। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। সেবার গুপীর ছেলের জ্বর আর কিছুতেই কমে না। বরাটকে ডাকা হলো। বরাট স্টেথো দিয়ে বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করতে গেলে গুপীর নেড়ি কুত্তা ডালু বিকট চিৎকার শুরু করে দিলো। বরাট মুখ ঘুরিয়ে হচ্ছেটা কি বলে একটা হুংকার দিলো। শোনা যায় কুকুরটা নাকি তিনদিন একটা শব্দও বার করেনি। এখনও যখন বেশি চেঁচামেচি করে তখন ডাক্তারবাবু আসছে বললে একদম চুপ করে যায়।

কায়স্থ পাড়ার হেবোর একদিন কাশির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এল। বরাট অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে বললো - যা দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ভিক্টর থেকে একটা বুকের এক্সরে করে এখানে চলে আয়। আমি লিখে দিচ্ছি। ডাক্তার ভট্টাচার্য্যিকে বলবি ভিজে প্লেটটা দেখে যেন আমায় ফোন করেন। হেবো ফিরে আসতে বরাট তাকে বললো - ওষুধগুলো লিখে দিলাম। একবছর খেতে হবে। বাদ যেন না যায়। তিনমাস পর পর আমাকে দেখিয়ে যাবি। মাস দুয়েক পর বরাট খবর পেলো হেবো ওষুধ খাওয়া বন্ধ করেছে আর বলে বেড়াচ্ছে অসুখ সেরে গেছে।

প্রত্যেক রবিবার সকালে বরাট দুটো বড় থলে নিয়ে মাছ কিনতে যায়। দুপুরে তিন রকম মাছ আর ভাত তার চাই। এটা তার একমাত্র নেশা। সেদিন বাজারে যাবার আগে সোজা হেবোদের তিনতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিলো। হেবোর মা দরজা খুললে বরাট বললো - হেবো কোথায়? হেবোর মা আঙুল তুলে ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। বরাট হেবোর মাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে হেবোর ঘরে ঢুকে পড়লো। হেবোর ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে। সে বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। বরাটকে দেখে উঠে বসলো। বরাট হেবোর দুগালে দুটো চড় কসিয়ে বললো - হতভাগা ছেলে সকাল আটটা বাজে এখনও বাবু বিছানায়। পড়াশুনা কখন হবে? হেবো মিউ মিউ করে কি যেন বলতে গেলো। বরাট তাকে সে সুযোগ না দিয়ে হেবোকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলে বললো - তুই ডাক্তার না আমি ডাক্তার? দুমাস ওষুধ

খেয়ে অসুখ সেরে গেছে না? ওষুধ যখন খাবি না তখন তোর বেঁচে থাকার কি দরকার? তোকে আমি তিনতলা থেকে নীচে ফেলে দেবো।

ইতিমধ্যে হেবোর বাবারে মারে চিৎকারে অন্য ফ্ল্যাটের লোকেরা জড়ো হয়েছে। তারা সবাই বরাটের ভয়ে এক বাক্যে স্বীকার করে নিলো হেবোকে তিনতলা থেকে ফেলে দেওয়াই উচিত কাজ হবে। শুধু বিশু খুড়ো বললেন - বাবা বরাট হেবো ওষুধ না খেয়ে অন্যায় করেছে ঠিকই। আর তার জন্য ওকে তিনতলা থেকে নীচে ফেলে দেওয়া যেতেই পারে। তবে কি ওকে ফেলে দিলে ও তো মরে যাবে। তাহলে আর তোমার ওষুধে ওর রোগ যে সারতো তার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। বরাট জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বিশু খুড়োর দিকে তাকালো তারপর হেবোকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বললো - নিজের কান মোল। দুগালে চড় মার তারপর কান ধরে নীল-ডাউন হয়ে সবার সামনে বল আর কোনোদিন ওষুধ খাওয়া বন্ধ করবি না আমি না বলা পর্যন্ত। ততক্ষণে হেবোর দুচোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে সুরু করেছে। বরাট এবার গলা চড়িয়ে বললো - কাল থেকে সকাল নটার সময় এক বোতল জল আর ওষুধগুলো নিয়ে আমার চেম্বারে যাবি। তারপর আমার সামনে ওষুধগুলো খেয়ে চেম্বার এর বাইরে পূবদিকের বারান্দায় আধঘণ্টা বসে থাকবি। মনে থাকবে? হেবোর আর কথা বলার ক্ষমতা নেই। সে শুধু ঘাড় নাড়লো। বরাট এবার হেবোর মার দিকে তাকিয়ে বললো - রাতের ওষুধগুলো আপনার সামনে খাবে। যদি শুনি খায়নি তাহলে আপনাকেও তিনতলা থেকে নীচে ফেলে দেব। তারপর ঘড়ি দেখে নিজের মনে আজ বাজার যেতে বড্ড দেরি হয়ে গেল বলতে বলতে বাজারের দিকে ছুটলো। বিশুখুড়ো হেবোর চিবুক ধরে মুখটা তুলে বললেন - বলিহারি তোমার বুদ্ধি বাবা। তুমি রাক্ষসের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গেছো। তুমি যে এখনও আস্ত আছো সে তোমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। তারপর হেবোর মার দিকে তাকিয়ে বললেন - বৌমা রাক্ষসটা কি বলে গেল শুনলে? ওকে ঘাঁটিও না।

মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের প্রধান প্রফেসর মুখার্জী তার প্রাক্তন ছাত্র বরাটকে খুব স্নেহ করেন। এমনও বলতে শোনা গেছে - বরাট একটু খ্যাপা হতে পারে কিন্তু ওর diagnosis একদম অভ্রান্ত। কয়েকবার আমিও ওর সঙ্গে পরামর্শ করেছি কায়দা করে। ওকে কখনও বুঝতে দিতে চাই না আমি ওর মতামত চাইছি।

সেবার বিখ্যাত দৌড়বাজ সুপ্রসন্ন মিত্র যাকে সবাই পেলু মিত্তির বলে চেনে তার মার রোগ নির্ণয় আর হয় না। ওজন কমছে। হিমোগ্লোবিন আটের নীচে নেমে গেছে। খিদে হচ্ছে না। পেটের মধ্যে অস্বস্তি। কোনো পরীক্ষায় কিছু ধরা পড়ছে না। পেলু সম্প্রতি ন্যাশনাল

গেমসে তিনটা সোনা নিয়ে এসেছে। ১০০, ২০০ আর ৪x১০০ মিটার রিলে এবং প্রথম ভারতীয় যে ১০ সেকেন্ডের কমে ১০০ মিটার দৌড়াতে পেরেছে। এবার নিশ্চিত অলিম্পিকে ভারতের দলে জায়গা পেয়ে যাবে।

বরাট খুব ব্যস্ত না কি? প্রফেসর মুখার্জী বরাটকে ফোন করলেন। না স্যার রোজ তো একই রকম। আপনি কেমন আছেন? ম্যাডাম কেমন আছেন? বরাট উত্তর দিলো। প্রফেসর মুখার্জী বললেন - একটা interesting case দেখবে নাকি? নিশ্চয়ই স্যার, আজ দুপুর তিনটের সময় আপনার ঘরে চলে যাবো - বরাট বললো।

যথা সময়ে বরাট প্রফেসর মুখার্জীর ঘরে যেতে প্রফেসর মুখার্জীর সহকারী রুদ্র একটা ফাইল এগিয়ে দিলো। বরাট ঠেলে ফাইলটা সরিয়ে রেখে বললো - আগে পেসেন্ট দেখি তারপর রিপোর্ট দেখা যাবে। প্রফেসর মুখার্জী ফিসফিস করে রুদ্রকে বললেন - বরাট কেমন করে একজামিন করে দেখো। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে বরাট ভদ্রমহিলার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পরীক্ষা করল। তিনবার ব্লাড প্রেশার মাপলো - শুয়ে, বসে আর দাঁড় করিয়ে। রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বললো - বেশ এ্যানিমিক। হিমোগ্লোবিনটা কত? সাত সাড়ে সাত? রুদ্র বললো - সেভেন পয়েন্ট থ্রি। বরাট জিজ্ঞাসা করলো - গত তিন মাসে ওজন কতটা কমেছে? রুদ্র বলল - বারো কেজি।

মাসিমা আপনার পেটটা আর একবার দেখবো বরাট বললো। প্রায় পাঁচ মিনিট লিভারের উপর হাত দিয়ে রইলো। তারপর বললো - স্যার চলুন আপনার ঘরে যাওয়া যাক। আমার দেখা হয়ে গেছে। প্রফেসর মুখার্জী বললেন - কি মনে হয় বরাট? বরাট বললো - লিভার cancer, early stage। রুদ্র বললো - কি line of treatment আপনি suggest করেন? বরাট সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রফেসর মুখার্জীর দিকে তাকিয়ে বললো - পেলুকে অলিম্পিকে নেড়া মাথায় দৌড়াতে হবে। তারপর রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বললো - কিছু করার নেই। ব্যথা বাড়লে ব্যথা কমার ওষুধ দিও। খুব বেশি হলে আর একশো দিন। প্রফেসর মুখার্জী বললেন - আমারও সে রকম মনে হচ্ছিল। বরাট বললো - স্যার আপনার হয়তো মনে নেই আমার ফাইনাল পরীক্ষায় এরকম একটা কেস পড়েছিল। আপনি এক ঘণ্টা জেরা করেছিলেন। প্রফেসর মুখার্জী বললেন - বিলক্ষণ মনে আছে। প্রফেসর বোস যিনি কাউকে কখনও ভালো বলেন না তিনি পর্যন্ত বলেছিলেন ছেলেটি মন্দ নয়। আমি যখন প্রফেসর বোসকে বললাম স্যার কত নম্বর দেবো উনি বললেন সব তো ঠিক বলেছে। তোমার যা ইচ্ছা দিয়ে দাও। তুমি ঐ পেপারে হায়েস্ট পেয়েছিলে। আমি যতদিন পরীক্ষক ছিলাম ততদিন কেউ তোমার চেয়ে বেশি নম্বর পায়নি। তুমি পোস্টগ্রাজুয়েট করলে না

কেন? বরাট বললো - স্যার আমার পড়তে ভাল লাগে কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া একদম পছন্দ নয়। আপনার চেলাগিরি করে যা শিখেছি তাতে আমার চলে যায়। আমি মেডিক্যাল জার্নাল নিয়মিত পড়ি। নতুন বই বার হলে কিনে ফেলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজ নিয়ে আর কি করবো?

বরাট প্রফেসর মুখার্জীর ঘর থেকে বেরোতে পেলু এগিয়ে এলো, বললো - ডাক্তারবাবু আপনার ফি কত টাকা? বরাট থমকে দাঁড়ালো। বললো - মাস্টারমশাই কাজ শেখাবার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আর তুমি আমাকে ফি দিতে এসেছো? আমি তোমার কানটা কামড়ে ছিঁড়ে দেবো। পেলু প্রথমে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড় লাগালো। বরাট দশ পা দৌড়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। পেলু ততক্ষণে ভালো স্টার্ট পেয়ে গেছে। তীর বেগে মেডিকেল কলেজের গেটের কাছে সিঁড়ির সামনে গিয়ে থামলো। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলো বরাট আসছে কিনা। পেলুকে অনেকেই চেনে। প্রায়ই কাগজে ছবি বেরোয়। দিন দুয়েক আগে আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছবি বেরিয়েছে। উপস্থিত রাস্তার লোকেরা পেলুকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দেখে অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। আনন্দবাজারের এক সাংবাদিক তার বাবাকে দেখতে মেডিকেল কলেজে ঢুকছিলো। পরদিন সে ফলাও করে ঘটনাটা খেলার পাতায় লিখে দিলো আর ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আর্জি জানালো বরাটকে যেন পেলুর সঙ্গে অলিম্পিকে পাঠানো হয়। বরাটের তাড়া খেলে পেলু অলিম্পিক থেকে নিশ্চয়ই একটা মেডেল আনতে পারবে।

* * * *

আজকে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। লালুদার হাতের গুড কন্ডাক্টের প্রাইজ সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছি। লালুদা হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন - তোমরা কি বলছিলে? গঙ্গা? ভালো খেলেছে? খেলবেই তো। আপন মনে আবার সিগারেট টানতে লাগলেন। বাবু জানতে চাইলো - গঙ্গাকে চেনেন নাকি? লালুদা এমন একটা মুখ করে আমাদের দিকে তাকালেন যেন সৌরভ গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাসা করা হলো দাদা বেহালা থেকে ইডেনের রাস্তাটা চেনো নাকি? লালুদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন - গঙ্গা? সে তো আমার হাতে তৈরি। বাবলা জানতে চাইলো - সে কি আপনি কবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে গেলেন? লালুদা গম্ভীর মুখে জানালেন - যাই নি তো। আমরা সবাই সমস্বরে বলে উঠলাম - তবে? লালুদা বললেন - সে এক লম্বা কাহিনী। ইতিমধ্যে লালুদার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সেটাকে টোকা মেরে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে লালুদা শুরু করলেন।

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। একদিন বিকেলে আমাদের নেতাজি স্পোর্টিং-এর ক্যাপ্টেন বিকাশ হাঁপাতে হাঁপাতে এলো। লালুদা সর্বনাশ হয়ে গেছে। কাল আমাদের রেলিগেশানের খেলা। দশজন প্লেয়ার জোগাড় হয়েছে। আপনাকে খেলতে হবে। হেরে গেলে আমরা সেকেন্ড ডিভিশনে নেবে যাবো। আমি বললাম খেলা ছেড়ে দিয়েছি অনেক বছর হলো। চোখে বাই-ফোকাল চশমা। দেখতে অসুবিধা হয়। না না আমাকে বাদ দাও। বিকাশ ঝুলোঝুলি করতে লাগলো। বাধ্য হয়ে রাজি হয়ে গেলাম। আলমারি থেকে সাদা প্যান্ট শার্ট বার করলাম। সৌভাগ্যবশত এই ক-বছরে মোটা হয়ে যাইনি। প্যান্টটা কোমরে ঠিক ফিট করে গেল। জুতো খুঁজতে অনেক সময় লেগে গেলো। রঙ দেবার আর সময় নেই। দেখলাম স্পাইক্সগুলো সব ঠিক আছে।

বিকাশ টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলো। আমাকে বলল লালুদা আপনি তো পাঁচ নম্বর এ ব্যাট করতেন। তাহলে আজও পাঁচ নম্বর এ নামবেন। আমি বললাম না আমাকে এগারো নম্বরে নামাও। বিকাশ শুনলো না। তৃতীয় উইকেট পরার পর আমি ব্যাট করতে নামলাম। স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা এক ফচ্‌কে ছোঁড়া বিদ্রূপ করে বললো দাদু আর ব্যাট হাতে নামা কেন? নাতির সঙ্গে লুডো খেললে ভালো হতো না? গার্ড নিলাম। প্রথম বলটা ফসকে গেলাম। পরের বলটা অনেকটা অফব্রেক করে আমার মিডল স্ট্যাম্পটা মাটিতে ফেলে দিলো। সেই ফচ্‌কে ছোড়া আবার টিপ্পনী কাটলো দাদু বাড়ি গিয়ে দুটো রসগোল্লা খেয়ে নেবেন। মাথা নিচু করে ফিরছি, একটা অল্পবয়সী ছেলে হন হন করে আমার পাস দিয়ে ব্যাট হাতে নেবে পড়লো। লালুদা এবার একটু থেমে আধ গেলাস জল খেয়ে নিলেন। তারপর আবার সুরু করলেন। মাঠের বাইরে চেয়ারে বসে প্যাড খোলা সুরু করেছি এমন সময় একটা বল সজোরে আমার পাশের চেয়ারটায় আছড়ে পড়লো। দেখলাম ঐ বাচ্চা ছেলেটা একটা দুর্দান্ত কাভার ড্রাইভ করে বল মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি প্যাড খোলা ভুলে গিয়ে ছেলেটার খেলা দেখতে লাগলাম। বিকাশকে জিজ্ঞাসা করলাম ছেলেটা কে হে? বিকাশ বলল আপনার বাড়ি ছাড়িয়ে গলির মুখে বীরেনদার ঘুড়ির দোকানটা দেখেছেন? এ ছেলেটি বীরেনদার ছেলে ধীরেন সাহা। মাত্র ৬৫ বলে বাচ্চাটা সেঞ্চুরি করে ফেললো। আমরা ২৩০ অল আউট। ফিল্ড করতে নামলাম। ওদের ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান দুটো খুব পেটাতে লাগলো। মাত্র ১৮ ওভারে ১২৮ রান করে ফেললো। বিকাশ দৌড়ে আমার কাছে এলো আর বললো লালুদা আপনাকে বল করতে হবে। তিন চারটা বল একটু এলোমেলো হলো। তোমরা তো জানো একসময় আমি লেগব্রেক গুগলি বল করতাম। ওদের এক নম্বর ব্যাটস্‌ম্যান আমার ওভারের শেষ বলটা লেগব্রেক মনে করে খেলতে গেলো। ওটা ছিল গুগলি। জোড়া পা উইকেটের সামনে। আম্পায়ার মাথার উপর আঙুল

তুলে দিলো। পরের ওভারে সেই ফচ্‌কে ছোঁড়া আমার বলের ফ্লাইট বুঝতে না পেরে আমার হাতে লোপ্পা ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলো। আমি ওকে ডেকে বললাম ওহে খেলার পর আমার কাছে এসে চার আনা পয়সা নিয়ে যেও। আর ললিপপ কিনে চুষো। দু-বছর ময়দানে ঘোরাঘুরি করে ঘাস চিনে তারপর ব্যাট হাতে নিও। ১২৮ নো লস থেকে ১৮০ অল আউট হয়ে গেলো।

খেলার পর ধীরেনকে ডাকলাম। বললাম তোমার খেলা খুব ভালো লেগেছে। দু চারটে ত্রুটি ঠিক করতে পারলে তোমার একজন বড় ব্যাটস্‌ম্যান হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ছেলেটি মাথা চুলকাতে লাগলো আর বললো আপনি ত্রুটিগুলি আমাকে দেখিয়ে দেবেন। পরদিন আমি বীরেনের সঙ্গে কথা বললাম। ডায়েট চার্ট করে দিলাম। সত্যিকারের কোচিং সুরু হয়ে গেলো। তিন বছর টানা ট্রেনিং দেওয়ার পর ধীরেন একজন পরিণত ব্যাটস্‌ম্যান হয়ে উঠলো।

লালুদা একটু থামলেন। উঠে গিয়ে জালনার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। হচ্ছে গঙ্গার কথা তারমধ্যে ধীরেন সাহা এল কোথা থেকে?

লালুদা জালনা ছেড়ে আবার চেয়ারে বসলেন। বললেন মাঝে মাঝে সবুজের দিকে তাকালে চোখটা বেশ হাল্কা লাগে। যাকগে যা বলছিলাম। এই সময় হঠাৎ আমি কলিন ডেভিস এর চিঠি পেলাম। কলিন আর আমি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির একই বছরের ব্লু। কলিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে অনেক টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। তখন জামাইকার ক্রীড়া মন্ত্রী। ডিয়ার লালু আমাদের দেশে আজকাল অনেকেই ক্রিকেট খেলতে চায় না। গত শতাব্দীতে অনেক ভারতীয় এদেশে এসেছে। তুমি কি দুই একজন কে এখানে পাঠাতে পারো যারা পরে আমাদের দেশের হয়ে খেলতে পারে? আমরা তার সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেবো। তখনি আমার ধীরেনের কথা মনে হলো। আমাদের এখানে যা পলিটিক্স বাংলার হয়ে খেলতে পারা কঠিন আর ভারতের হয়ে খেলার চিন্তা না করাই ভালো। ধীরেনকে বলতে সে এক কথায় রাজি হয়ে গেলো। ওর বাবাকে বোঝাতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেলো। কলিনকে লিখে দিলাম একটা ছেলে পাঠাচ্ছি, একেবারে আমার হাতে তৈরি। শেক্সপীয়ার বলেছেন নামে কি এসে যায়। আমার তা মনে হয় না। তোমরা জানো গত ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপে বিকাশ ধোরাসু ফ্রান্সের দলে থেকেও পাত্তা পেল না। ওর নাম যদি বিকে ধঁসে হতো তবে নিশ্চয়ই প্রথম এগারোতে নিয়মিত খেলতো। তাই অনেক ভেবেচিন্তে ধীরেন নামটা ড্যারেন করে দিলাম। ড্যারেন সাহা নামটা ঠিক পছন্দ হলো না। বড্ড বেশি বাঙালী গন্ধ আছে। হঠাৎ

মনে পড়লো ওর বাবার দোকানটা গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে। তাই নামটা দিলাম ড্যারেন গঙ্গা। বেশ মানিয়ে গেল রোহন বাবুলাল কানহাই, চন্দ্রপল, রামদীন, শিবনারায়ণদের দলে। তাই বলছিলাম গঙ্গা ভালো খেলবে না তো কে খেলবে? ও যে একেবারে আমার হাতে তৈরি।

লালুদা এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আরে আমার একটা মিটিং আছে। তোমরা বসো। চা খেয়ে যেও। আমি চললাম।

এতক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিনি। বসার ঘর আর ভেতরের ঘরের মাঝের পর্দার তলা দিয়ে শাড়ির পাড় দেখা যাচ্ছিল। লালুদা বেরিয়ে যেতে বৌদি ঘরে ঢুকলেন। কেমন গল্প শুনলে তোমরা? তোমাদের দাদা কিন্তু এদিকে কাকদ্বীপ আর ওদিকে রানাঘাটের বাইরে কখনও গেছেন বলে শুনিনি। তোমরা একটু বসো। সিঙ্গারা ভাজছি। চায়ের সঙ্গে মন্দ লাগবে না!

March 2011